চার্বাক নীতিবিদ্যা বা সুখবাদ

চার্বাকদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বের সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে। যেহেতু তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী, তাই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত কোন বিষয়েরই সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করেন না। চার্বাক নীতিতত্ত্বও এই সিদ্ধান্তের বাইরে নয় অর্থাৎ নীতিতত্ত্বের ওপর জড় প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য করা যায়। নীতিতত্ত্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল মানব জীবনের পরম কাম্য বিষয় অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ কী ? চার্বাক মতে, সুখভোগই জীবনের পরম কাম্য বস্তু বা পুরুষার্থ। এইক্ষেত্রে মীমাংসকরা বলেন, স্বর্গ-সুখভোগই জীবনের পরম পুরুষার্থ এবং তা লাভ করা যায় বৈদিক ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। স্বর্গে কেবল অনাবিল সুখ। তাই বৈদিক ঋষিগণ বলেন, 'স্বর্গকামো যজেত'। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকদের মতে, মৃত্যুর পরে জীবনের কোন অস্তিত্ব থাকে না। দেহের বিনাশে চেতনার বিনাশ এবং যেহেতু আত্মার কোন অস্তিত্ব নাই, সেহেতু মৃত্যুর পরে স্বর্গ-সুখভোগের কোন প্রশ্নই নাই।

বৈদিক যুগে কাম্য কর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন পুত্রকামো যজেত, পত্নীকামো যজেত, পশুকামো যজেত, ঋদ্ধিকামো যজেত, মিত্রকামো যজেত ইত্যাদি ইত্যাদি। পুত্র, পত্নী, পশু, ধন প্রভৃতি কামনার বস্তু লাভ করলে কিংবা তা উপভোগ করলে যা অনুকূল বেদনা হয় তাকেই সুখ বলে। পুত্র, পশু, ধন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি হল সুখের সাধন। সুখই চরম বা পরম লক্ষ্য। আর যাগ-যজ্ঞ, দানাদি পূণ্যকর্ম সকলই উপলক্ষ্য মাত্র। আমরা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক, নিজের জন্য হোক কিংবা পরের জন্য হোক ইহকালের জন্য হোক কিংবা পরকালের জন্য হোক সুখই আমাদের পরম লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে চার্বাক ঋষিগণ বলেন, 'কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ'। কাম্য বস্তুই মানুষের প্রেয়। প্রিয়বস্তু লাভ করলে যে সুখের উদয় হয়, তাই মানুষের চরম লাভ।

অপরপক্ষে কঠোপনিষদের ঋষিদের মতে, মানুষের পরম পুরুষার্থ কাম বা সুখ হতে পারে না। যা প্রেয় তা শ্রেয় হতে পারে না। আবার যা শ্রেয় তা প্রেয় হতে পারে না। শ্রেয় এক, প্রেয় আর এক। শ্রেয় প্রেয় হতে পৃথক। পরবর্তীকালে এই 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়'র মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির ফলেই ভোগবাদ ও ত্যাগবাদের সৃষ্টি হল। যাঁরা প্রেয়র উপাসনা করলেন, তাঁরা শ্রেয়কে পেলেন না। আবার যাঁরা শ্রেয়র উপসনা করলেন, তাঁরা প্রেয়কে পেলেন না। যাঁরা শ্রেয়কে চান, তাঁরা প্রেয়কে বর্জন করলেন। ভোগের দ্বারা শ্রেয়কে অর্থৎ শ্রেয়বস্তুকে পাওয়া যায় না। ত্যাগের দ্বারা প্রেয়বস্তুলাভ সম্ভব হয় না।

এইভাবে ভারতীয় দার্শনিকগণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন - একদল ভোগবাদী, অপর দল ত্যাগবাদী। একদল সুখবাদী, অপর দল দুঃখবাদী। একদলের মতে, জগতে সুখই বেশী, দুঃখ থাকলেও তা নগণ্য। অপর দলের মতে, জগৎ দুঃখময়, জগতে সুখের লেশ মাত্র নাই। যা আছে তা সুখের আভাস মাত্র। সেই সুখাভাসও আবার ক্ষণিক, স্বল্প ও দুঃখমিশ্রিত। সুতরাং সেই সুখ এবং তার সাধন ভোগকে পরিত্যাগ করতে হবে। চার্বাক ভোগবাদী, অন্যান্য দার্শনিকগণ ত্যাগবাদী। চার্বাকগণ ভোগজন্য সূখকে ক্ষণিক, স্বল্প বা দুঃখমিশ্রিত বলে অনাদর করেন না।

চার্বাকমতে, ভোগীর সুখ ক্ষণিক বলে, তা মিথ্যা বলা যায় না; কারণ ক্ষণও মিথ্যা নয়। মালতী কুসুমের আয়ু কিংশুকের ন্যায় দীর্ঘ নয় বলে কে তাকে মিথ্যা বলে অনাদর করে। আয়ুর দীর্ঘতাই সত্যাসত্য নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড নয়। প্রত্যেকদিন আমাদের বাগানে যে ফুল ফোটে, তার থেকে কৃত্রিম ফুলের স্থায়িত্ব অনেক বেশী। কিন্তু তাই বলে আমরা আমাদের বাগানে প্রস্ফুটিত অস্থায়ী ফুলকে উপেক্ষা করে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী কৃত্রিম ফুলকে আদর করি না। জলাশয়ে যে পদ্মফুল ফোটে তা অপেক্ষা পর্বতের একটি শিলাখণ্ড অনেক বেশী স্থায়ী। কিন্তু তাই বলে আমরা কেউই পদ্মফুলকে উপেক্ষা করে শিলাখণ্ডকে আদর করি না। ফলে চার্বাকমতে, যাই ক্ষণস্থায়ী, তাই কিন্তু উপেক্ষার পাত্র নয়।

আবার অল্প হলেও ভোগজন্য সুখকে অনাদর করা উচিৎ নয়। কারণ অল্প অল্প করে যে অল্পের সমষ্টি তা অল্প নাও হতে পারে। যেমন বিন্দু বিন্দু জলকণা গড়ে তোলে মহাসাগর, বিন্দু বিন্দু বালুকণা যেমন গড়ে তোলে মহাদেশ; তেমনি অল্প অল্প সুখ একদিন মহা সুখ দান করবে। তাঁদের মতে মানব জীবনে ভোগজন্য এই অল্প অল্প সুখই একদিন বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে।

চার্বাক দার্শনিকগণ আরও বলেন, ভোগজন্য সুখকে একেবারে উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। যা অবর্জনীয়রূপে একান্তভাবে সুখের সঙ্গে এসে পড়ে, সেরূপ দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে সুখভোগ করতে হবে। আমরা যারা মাছ খাই, তারা মাছের কাঁটা ও আঁশ বর্জন করে উপাদেয় বা সুস্বাদু অংশ গ্রহণ করি। কিন্তু তাই বলে মাছের কাঁটা ও আঁশ আছে বলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা বর্জন করে না। আবার আমরা যারা ভাত খাই তারা ধান ছাড়িয়ে চাল তৈরী করে ভাত রান্না করে খেতে হবে বলে তা বিরত থাকিনা।

পশুর দ্বারা শষ্য নষ্ট হবে বলে কৃষকেরা কৃষিকার্য বন্ধ করে না। ভিক্ষুকেরা খেতে চাইবে বলে গৃহস্থ রান্নাকার্য থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে না। চার্বাকরা আরও বলেন, যদি কোন ভীরু দুঃখভয়ে দৃষ্ট সুখ পরিত্যাগ করে, তাহলে তার মতো কাপুরুষ আর পৃথিবীতে নাই। যদিও আচার্যগণ বলেন, বিষয়ের উপভোগ হতে যে সুখ উৎপন্ন হয় তা দুঃখমিশ্রিত, তাই তা বর্জনীয়। চার্বাকমতে এরূপ বিচার পদ্ধতি মূর্খদের ক্ষেত্রে মানায়। বদ্ধিমানের ক্ষেত্রে নয়। যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল কামনা করে, সে যদি বুদ্ধিমান হয়, তাহলে সে কখনও তুষাদি মিশ্রিত বলে উত্তম শুভ্রবর্ণ তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে না।

তাই বলতে হয় সুখ ভোগ করতে হলে দুঃখভোগ অপরিহার্য। তবুও তাকে যথাসম্ভব পরিহার করে সুখভোগ করাই বুদ্ধমান ব্যক্তির কর্তব্য। ক্ষণিক হলেও, অল্প হলেও, কিংবা দুঃখমিশ্রিত হলেও, যে সুখটি বর্তমান মুহূর্তে নাগালের মধ্যে বা আয়ত্তের মধ্যে আছে তাকে ত্যাগ করা উচিৎ নয়। আগামীকাল একটি ময়ূর পাব, যদি আজকের প্রাপ্ত কপোতটিকে ত্যাগ করি বা ছেড়ে দিই। চার্বাকবতে এটা অত্যন্ত মূর্খামির পরিচয়, বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ অতীত আমার আয়ত্তে নাই, ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করা যায় না। কেবল বর্তমানই আমার কাছে বাস্তব, প্রত্যক্ষ উপলব্ধ। তাই বর্তমানের সার্থক ভোগের দ্বারা জীবনকে উপভোগ করতে হবে। এরূপ যতদিন বেঁচে থাকবে ভোগসুখের দ্বারা বেঁচে থাকতে হবে, দরকার হলে ঋণ করে ঘি খেতে হবে(যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ) - ‘পিব, খাদ চ’। কারণ, কাম্য বস্তুর উপভোগই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বা পুরুষার্থ।

চার্বাক দার্শনিকদের মতে, মানুষের পক্ষে মৃত্যু কোন অমঙ্গল নয় - মৃতের পক্ষেও নয়, আবার জীবিতের পক্ষেও নয়। কারণ মৃতের কোন অনুভূতি থাকে না। আবার জীবিতের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় না। সুতরাং জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই মানুষ মৃত্যুর সত্তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বলা যায় মৃত্যু কোন অবস্থাতেই মানুষের পরম অকল্যাণ হতে পারে না। তাই বৃথা মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে জীবনকে নিঃশেষে উপভোগ করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ।

সুখবাদী চার্বাকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর চার্বাক একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ, স্থূল, ইন্দ্রিয় উপভোগজন্য, পশুসুলভ সুখকেই তারা গ্রহণ করে থাকেন। এঁদের মতে, 'অঙ্গনার আলিঙ্গনজন্য সুখমেব পুমার্থতা'। এরূপ সুখ একান্তই পশুবৎ হলেও শরীরের জন্য উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। ইন্দ্রিয়াদির যথাযথ তৃপ্তি না ঘটলে মানুষের পক্ষে উন্মাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। ভবিষ্যতে অধিকতর ও উৎকৃষ্টতর সুখের একান্ত সম্ভাবনা থাকলেও এই শ্রেণীর চার্বাকগণ বর্তমানকালে লভ্য সুখের বিন্দুমাত্র ত্যাগ করতে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিতলভ্য সুখপ্রাপ্তির জন্য কোনও যত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করতে রাজী নন।

আবার অপর এক শ্রেণীর চার্বাকদের মতে, ঐরূপ সুখভোগ করতে গেলে সুখেরই আত্মঘাত ঘটে থাকে। মানব সমাজে এরূপ অলস ও অসহিষ্ণু মনোভাব বিপজ্জনক। কারণ, এই সকল সূখবাদীগণ ভবিষ্যতে প্রচুর শষ্যলাভের সম্ভাবনা থাকলেও বর্তমানে বিশ্রামজন্য ক্ষুদ্র সুখকে বিসর্জন দিয়ে ভূমিকর্ষণ বা বীজ বপনের কষ্ট করবে না। এই শ্রেণীর চার্বাকদের মতে, সুখভোগের আকাঙ্খাকে অঙ্কুরে দমন করতে না পারলে সুখভোগই অসম্ভব হয়ে পড়ে। পশুসুলভ অনয়ন্ত্রিত ও অসংযত সুখ সুখপদবাচ্যই নয়।

তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয়গণকে সুসংযত, নিয়ন্ত্রিত, মার্জিত ও সুশিক্ষিত করতে না পারলে তারা অসভ্য বন্যজন্তুর ইন্দ্রিয়গ্রামের ন্যায় উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে। এরূপ সুখ কখনও সুসভ্য ও সুশিক্ষিত মানুষের কাম্য হতে পারে না। একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগজন্য সুখই কাম্য হলে সমাজব্যবস্থা বা লোকযাত্রা ব্যাহত হয়। নিজের সুখের অংশবিশেষও উৎসর্গ করে অন্যকে দিতে না পারলে, সামাজিক জীবন-যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এই শ্রেণীর চার্বাকগণ উদার, বহু জনের উপভোগ্য, নিষ্কলুষ ও কালে কালে স্থায়ী কলাবিদ্যাদির অনুশীলনে লভ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুখের অনুভূতিকেও বরণ করে নিয়েছেন।

অপরপক্ষে আর এক শ্রেণীর চার্বাকগণ আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন, জীবমাত্রই সাধারণ যে সুখ কামনা করে তা আমাদের পুরুষার্থ নয়। আমরা জীব হলেও মানুষ। আমাদের পুরুষার্থ হল মানবোচিত সুখ, দুঃখকে বর্জন করে যে সুখ সেই সুখ নয়, পরন্তু দুঃখকে আত্মসাৎ করে যে সুখ, তাই প্রকৃত সুখ। সেই সুখের নাম ভূমা। 'ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি'। ভূমাতেই আনন্দ। আর এই আনন্দই মানুষের পরম পুরুষার্থ।

জীবমাত্রেরই সাধারণতঃ আহার, বিহার প্রভৃতি জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ হলে তাদের আকাঙ্খার নিবৃত্তি ঘটে এবং তারা সুখী হয়। জীবেদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। মানুষও জীব। সুতরাং তারও এই আকাঙ্খা আছে। এইরূপ আকাঙ্খা যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেখানেই তার দুঃখ। আর যেখানে পূর্ণ হয়, সেখানেই তার সুখ বা আনন্দ। কিন্তু এই সুখভোগ জৈবিক, এতে কোন মনুষ্যত্ব নাই।

কিন্তু প্রাণী জগতের মধ্যে কেবল মানুষেরই আর এক প্রকার আকাঙ্খা আছে, তা কিন্তু জৈব প্রয়োজনের আকাঙ্খা নয়। তা জ্ঞানের আকাঙ্খা, কর্মের আকাঙ্খা, প্রেমের আকাঙ্খা। এই আকাঙ্খার অন্ত নাই, নিবৃত্তি নাই, পরিতৃপ্তি নাই। ইহা বলে আরও, আরও, আরও, আরও। সে সীমায়িত জৈব সুখকে অগ্রাহ্য করে, দুঃখকে বরণ করে, আত্মস্যাৎ করে, অসীম অনন্তের সন্ধানে কেবল অগ্রসর হতে চায়। এই আকাঙ্খার গতি আছে, কিন্তু গন্তব্য স্থান নাই। এই আকাঙ্খাই মনুষ্যত্ব, ইহাই ভূমার সাধনা। ইহাই আনন্দের তপস্যা। জৈব সুখের আকাঙ্খার নিবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু আনন্দের আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি নাই।

জৈব সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নয়। আনন্দ দুঃখকে স্বীকার বা বরণ করে নেয়। এই শ্রেণীর চার্বাকগণ কেবল জৈব সুখকে সুখ বলে মানতে রাজী নন। তাঁরা উপনিষদের ঋষির সাথে সুর মিলিয়ে বলেন, 'ভূমৈব সুখম'। ভূমা বা আনন্দই যথার্থ সুখ। 'নাল্পে সুখমস্তি' - অল্প, সীমায়িত জৈব সুখ, সুখই নয়। অসীম অনন্ত, পরিতৃপ্তিহীন আনন্দময় সুখই ভূমা, ভূমাকেই জানতে হবে। এই চার্বাকদের মতে আচার্য বৃহস্পতিও তাঁর 'সুখমেব পুরষার্থঃ' - এই সূত্রে সুখ বলতে বৃহত্তর সুখকে, আনন্দ বা ভূমাকেই বুঝিয়েছেন। 'কাম এবৈক পুরুষার্থঃ' - এই সূত্রেও তিনি 'কাম' শব্দের দ্বারা মানবোচিত কামনাকেই বুঝিয়েছেন। জৈব আকাঙ্খাকে নয়। সুতরাং আনন্দই মানুষের পরম পুরুষার্থ, জৈব সুখ নয়। এই সম্প্রদায় মূলতঃ ঔপনিষদিকগণের অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এদেরকে সাধারণতঃ সুশিক্ষিততর চার্বাক বলা হয়।